মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

# বিপ্লব হালিম-এর

## ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

## বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান

(৫ম বর্ষ)

# মুখবন্ধ

ভারতের এবার স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে যে নবজাতকেরা চোখ মেলেছিল, সেই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্যতম ছিলেন বিপ্লব হালিম। জন্ম ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

সারাজীবন তিনি অগুনতি সাধারণ মানুষের মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন, তাদেরই একজন হয়ে। সেটাই তাঁর বড় পরিচয়।

তবে সাধারণ মানুষের মনে তিনি এক বিশেষ সম্মানের আসন অর্জন করেছিলেন, কারণ আপামর জনতার কল্যাণের জন্য, তাদের মৌলিক মানবাধিকারের জন্য, সারা জীবন ছিল তাঁর অক্লান্ত ও আপোষহীন পথচলা। জীবনের বাঁকে যেমন বহু বিখ্যাত ও গুণী মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, তেমনি স্পর্শ করে গেছেন বহু নাম না জানা মানুষের হৃদয়কে। সদালাপী, হাস্যমুখ বিপ্লব হালিম, জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছেন মানুষকে, গণ আন্দোলনের প্রভাবকে, বিশ্বাস করেছেন সংগঠনের গুরুত্বকে। দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে তাঁর স্বপ্ন ছিল জন-গণতন্ত্রের, যেখানে মানুষ সত্যিকার অর্থেই তার উন্নয়নের দিশা নিজেরাই নির্ধারণ করবে, সুশাসনে অংশ নেবে, রাজনীতিতে দায়বদ্ধতার জায়গাটাকে সুদৃঢ় করবে। এক কথায় সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উপরে উঠে এমন এক সমাজের গঠন করবে; যার মূলে থাকবে সাম্য, মৈত্রী, একতা ও প্রগতি। এই লক্ষ্যেই সারাজীবন দলীয় রাজনীতির থেকে দূরে থেকেও তিনি নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে নিরলস কাজ করে গেছেন।

প্রায়ই তিনি বলতেন, নাগরিক সমাজের ইতিহাস মানব সভ্যতায় সুপ্রাচীন। মানব সভ্যতার বিকাশে নাগরিক সমাজ যুগে যুগে নেতৃত্ব দিয়েছে। নাগরিক সমাজ মানে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী মানুষেরা নন, প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি দেশবাসীই সে দেশের নাগরিক সমাজ। বিপ্লব হালিম বিশ্বাস করতেন নাগরিক সমাজের

অগ্রনায়কদের নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকা উচিত আর তাঁদেরও দায়বদ্ধ থাকা উচিত জনসাধারণের কাছে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে নয়। নিজে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজের এক পরিচিত মুখ; যিনি সত্যের পক্ষ, মেহনতি মানুষের পক্ষ নিতে কোনদিন দ্বিধা করেননি। আজ তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে এবারের স্মারক বক্তৃতার বিষয় 'নিরপেক্ষতা ও নাগরিক সমাজ'। বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে বড়ই প্রাসঙ্গিক এই আলোচনা। এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই বিপ্লব হালিমের মত কর্মযোগী মানুষের স্মৃতির প্রতি আমাদের এবারের শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন। এরই সাথে অন্য বছরের মতন, এবছরেও বিশিষ্ট নাগরিক তথা সমাজেসেবীদের হাতে আমরা স্মারক সম্মান তুলে দিতে পেরে আনন্দিত। আর এ বছর স্মারক বক্তৃতার পরে সম্প্রীতি ভাবনার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, আশা করি তা এ রাজ্যের সর্বস্তরে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতার এবার পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত মাননীয় অতিথিবৃন্দদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমার ও বিপ্লব হালিমের সেই সকল সহকর্মীদের, যাদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও ভালোবাসায় বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব হয়েছে।

বিপ্লব হালিমের ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত, এবারের স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী হালিম

**(উজ্জয়িনী হালিম)**
ইমসে

**মীরাতুন নাহার ঃ** জন্ম ১ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে উত্তর ২৪ পরগণার বৌলগাছি গ্রামে, নানার বাড়িতে। কলকাতা লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের সাম্মানিক স্নাতক (১৯৬৯) তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ১৯৭১ সালে এম.এ. এবং পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯০ সালে।

১৯৭৫-২০০৯ পর্যন্ত তিনি কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা শেষে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে পত্রিকা (দোলন চাঁপা) সম্পাদনা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনে বিভিন্ন পদের দায়-দায়িত্ব পালন সহ রেডিও-টেলিভিশন-সেমিনার-কনফারেন্স প্রভৃতিতে নিয়মিত অতিথি ও বক্তার ভূমিকা গ্রহণে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিরন্তর লেখালেখিতে ব্যস্ত সময় কাটে তাঁর।

পারিবারিক জীবনে তিনি এক কৃতী কন্যাসন্তানের জননী এবং তাঁর জীবনসঙ্গী একজন অবসরপ্রাপ্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

**লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ**

- কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু: গৌরী আইয়ুব স্মারকগ্রন্থ, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং
- রোকেয়া রচনা সংগ্রহ (১ম সংস্করণ), (সম্পা.) ২০০১, বিশ্বকোষ পরিষদ
- Other Minds: Analogical Argument Revisited, 2002, Radiance
- লুকানো রতন: রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা, ২০০৬, সুরাহা-সম্প্রীতি, কলকাতা
- অন্তঃস্বর মেয়েদের কথায় মেয়েরা, ২০০৭, রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
- মতিচূর (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড): রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, (সম্পা.) ২০১০, সুরাহা-সম্প্রীতি, কলকাতা
- Selected Nazrul: The Singer of Equality (ed.), 2012, Nazrul Sanskriti Parishad
- দেশকন্যার কলমে, ২০১২, এবং মুশায়েরা
- সংখ্যালঘু মানবী আমি, ২০১২, গাঙচিল
- জীবনশিল্পী রোকেয়া, ২০১৩, উদার আকাশ
- স্বাদ বদলের গল্প, ২০১৭, কাগজের ঠোঙা
- জীবনশিল্পী রোকেয়া (২য় সংস্করণ) ২০১৭, দোয়েল
- সংস্কৃতি-সৈনিক বাহারপুত্রী সেলিনা, ২০১৭, বিশ্বকোষ পরিষদ
- সেই মেয়েটির কথা, ২০১৭, রেডিয়্যান্স
- রক্তলেখায় নিমগ্ন নজরুল (সম্পা.) ২০১৮, জিজ্ঞাসা
- অমৃতে-বিষে, ২০২২, জিজ্ঞাসা

# নিরপেক্ষতা ও নাগরিক সমাজ

মীরাতুন নাহার

সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়েছে প্রধানত তাদের নৈতিক জীবনের জন্য। প্রতিটি মানুষের জন্য নৈতিক জীবন যাপন করা তার অবশ্যকর্তব্য। অন্যথায় তার মনুষ্য-পরিচয় অর্থ হারায়। মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে তাই নৈতিকতা সম্পর্কিত আমার নিজস্ব কয়েকটি বিশ্বাসের কথা নিবেদন করতে চাইছি কেননা, নিরপেক্ষতার সঙ্গে নৈতিকতার নিবিড় যোগ অনস্বীকার্য।

**ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতা ঃ**

দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে দীর্ঘ বছর ধরে অধ্যাপনা করার সূত্রে আমি নৈতিক দর্শন সম্পর্কে অধিক আগ্রহী হই। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টকে আমার গুরু মেনে নিই। তাঁর কাছ থেকে জীবন যাপনের প্রক্রিয়া আমি শিখে নিই। প্রশ্ন জাগে মনে - নৈতিক জীবন যাপন করতে হলে ভাল কাজ করে যেতে হবে এবং মন্দ কাজকর্ম পরিহার করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল, ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যাবে কিভাবে? কান্ট তিনটি উপায় বাত্‌লে দিলেন তার মধ্যে দুটি মনের মতো হয়েছে মেনে নিয়ে সে দুটি পন্থাই অবলম্বন করে চলেছি এখনও পর্যন্ত। সে দুটির কথা বলে নিয়ে মূল কথা শুরু করা যেতে পারে।

**এক.** যে প্রক্রিয়ায় অন্যে কোন কাজ করলে তুমি মানতে পারবে না সেটি তুমি অবলম্বন করবে না। যেমন, কেউ চুরি করলে তুমি তা মানতে পারবে না। অতএব চুরি করাকে মন্দ কাজ বলে গণ্য করবে।

**দুই.** কোন মানুষকে কখনও উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা উচিত কর্ম। কারো অর্থাভাব দূর করা লক্ষ্য হলে তাকে সে কারণে নিজ স্বার্থ সিদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করা অনুচিত কর্ম। সেটি পরিত্যাজ্য। সহায়তা দেওয়াই সেক্ষেত্রে ভাল বা উচিত কর্ম বলে পরিগণিত হবে, কোনভাবে তাকে ব্যবহার না করে।

ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে পথ চলায় এ ব্যাপারে আমার জন্মদাতা হয়েছেন আমার অপর পথ প্রদর্শক। পরনিন্দা এবং অন্যের জন্য ক্ষতিকারক কর্ম তিনি সারাজীবন পরিত্যাজ্য বলে মেনে তেমন ধারাতেই জীবন যাপন করেছেন।

সেই সঠিক অর্থে বড় হৃদয়ের মানুষটিকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই কেননা, প্রাত্যহিক জীবনে এই দুটি উচিত কর্মকে মেনে চলা নিঃসংশয় কঠিন কর্ম। প্রথমটি মেনে চলা প্রায় অসম্ভব হয়েছে বলা চলে। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত কম কঠিন বলে কিছু মাত্রায় হলেও সফল হওয়াটা সেক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। বলা আবশ্যক, এই মহানুভব ব্যক্তি-মানুষটি কাজেই শিখিয়েছেন নৈতিক জীবন কাকে বলে, কথায় কখনও নয়।

এই প্রকার কঠোর নীতিশিক্ষা লাভে দীক্ষিত মন আমার সর্বক্ষণ খুঁজে ফেরে নৈতিক জীবন যাপনের আবশ্যকতা মেনে মানবাধিকারের দায় বয়ে বেড়ানো মানুষ-জন ও গোষ্ঠী-সংগঠনকে। সেই সূত্র ধরেই ভাবি মানবাধিকার রক্ষায় দেশবাসী তথা নাগরিক সমাজের যথাযথ ভূমিকার কথা। নাগরিক সমাজ বলতে এক্ষেত্রে বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিভা-মেধা-সৃজনশীলতার স্বীকৃতি ও বহুবিধ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত জ্ঞানী-গুণী এবং মান্যতা লাভকারী দেশবাসীদেরই বিশেষভাবে বোঝাতে চাইছি। এই নাগরিক সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে দু'চারকথা বলার আবশ্যকতা অনুভব করছি। তাঁদের নৈতিক বোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছু ভাবনা তুলে ধরতে চাইছি। এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের এবং সমগ্র দেশের পরিস্থিতি দাবি করছে - তাঁদের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণের বাস্তবতা। কেমন সেই পরিস্থিতি? 'বুঝে নেওয়া' যাক!

**বর্তমান দেশীয় পরিস্থিতিঃ**

- নানা দিক থেকে বঞ্চিত দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা অবর্ণনীয়। তাই বাধ্য হয়ে তারা অসদুপায়ে জীবন ধারণ করার পথে এগিয়েছেন। বাস্তব চিত্র এমন সত্যকেই তুলে ধরছে।
- দেশের নেতানেত্রীগণ দেশের সর্বস্তরের মানুষদের সামাজিক মন ধ্বংস করে ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাদের অনুগত শিষ্য বানিয়ে ফেলছেন দুর্নীতির জালে আটকে দুর্জন বানিয়ে।
- দলীয় রাজনীতি গণতন্ত্রকে নিঃশেষ করার লক্ষ্য নিয়ে দৈত্যের ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়েছে আজ। গণ-জাগরণ রুদ্ধ করার কাজে এই রাজনীতির তৎপরতা বিস্ময়কর।
- জাতীয়তাবাদের নামে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢালার কাজ চলছে দেশ জুড়ে সর্বত্র।

- এই সময়ে চলমান রাজনীতি দেশবাসীকে অপরাধী করে গড়ে তোলার রাজনীতি। নৈতিকতা ভুলে যাচ্ছেন মানুষ-জন দ্রুত লয়ে নীতিহীনতাকেই বাঁচার পথ ভেবে আঁকড়ে ধরে।
- গ্রামবাসীরা আজ পরস্পরের বৈরি। দলীয় পরিচয়ের ভিন্নত্বের কারণে তারা মিত্রতা ভুলে হিংসায় মেতে থাকছেন।
- গ্রাম ক্রমশ শহরে রূপ নিচ্ছে যেটি ভয়াবহ ভবিষ্যতের সূচনা তৈরি করে চলেছে দুরন্ত গতিতে।
- 'রাজনীতি' আজ নিন্দাসূচক শব্দ। সেটি সম্ভব করে তুলেছেন রাজনীতির ধারক-বাহকরাই।
- ধর্ষণ আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মারাত্মক বিপদের লক্ষণ হল, মনুষ্যত্ব হত্যাসাধক এই প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক লাভালাভের হিসাবের ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে গণ্য হয়েছে বিনা বাধাতেই।
- সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয়টি হল, নামী-দামী নাগরিকজনেরাও আজ রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য মেনে নিয়ে জীবনের পথ চলছেন।

এমন হতাশাব্যঞ্জক দেশীয় পরিস্থিতিতে উল্লেখিত নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বাভাবিক ভাবেই উত্থাপিত হয় আর সেকারণেই নিরপেক্ষতা ও নাগরিক সমাজ সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার পরিসর তৈরি হয়েছে এবং বিষয়টি একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মারক বক্তৃতার বিষয় হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছে। এবার মূল বিষয়টিতে আসা যাক।

**নাগরিক সমাজের নিরপেক্ষতা ঃ**

পশ্চিমবঙ্গ নামক আমাদের রাজ্যে তথা সমগ্র দেশটিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করে যে রাজনৈতিক দল শাসক দল বনে যায় এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ - উভয় পক্ষেরই রাজনীতি ক্ষমতাকেন্দ্রিক বলে লক্ষ করা যায়। ক্ষমতা একবার পেলে অথবা আবার পেলে দেশবাসীর জন্য 'স-অ-ব' কাজ করে দেব - দু তরফের মুখে এমন বাণী শোনা যায়। দেশবাসীও তাদের থেকে শিখে ফেলেন - ক্ষমতাই আসল কথা। তারা বুঝে নেন, ক্ষমতা-পূজোতেই 'স-অ-ব' মেলে! অথচ রজৈনতিক নেতৃবর্গের কারো মনের কোণেও দেশ বা দেশবাসীর কল্যাণভাবনা ঠাঁই পায় না, লক্ষ করা যায়। যদি পেত তাহলে তাঁরা কখনই বলতে পারতেন না এমন কথা - আমাদের দলের কর্মীরাই আহত অথবা নিহত হয়েছে! তাঁদের মুখে

কখনও শোনা যায় না আমাদের রাজ্যের / দেশের মানুষ আহত অথবা নিহত হয়েছে! এইসব নেতৃবর্গের আনুগত্য না মেনে তাঁদের চাপে রাখা গুণী-মানী-বিখ্যাত নাগরিকজনদের নৈতিক কর্তব্য। তাঁরা নিজেরা কোন দলের স্তাবকতা না করে তাদের নিরপেক্ষ হতে বাধ্য করবেন আর সেটি সম্ভব নিজেরা নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকতে পারলে, তবেই। এভাবে নেতৃবৃন্দকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলতে বাধ্য করা সম্ভব। কিন্তু নাগরিক সমাজকে সে পথে চলতে হলে বাস্তব কিছু প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। সেগুলি কীরকম?

সেই বাধাগুলি হল, বিবিধ প্রকার জাগতিক সুযোগ-সুবিধা, সম্মানজ্ঞাপক পুরস্কার, পদক, পারিতোষিক ইত্যাদি। এগুলি পাওয়ার বাসনা প্রবল হয়ে দেখা দেয় গণ্য-মান্য নাগরিকজনদের মধ্যে। ভুলে যান তাঁরা তখন নেতৃবৃন্দের কৃত অন্যায় কর্মাদির বলিষ্ঠ, নির্ভীক প্রতিবাদ এবং ন্যায়কর্মের সমর্থনসূচক কর্মকান্ড ঘটানো নামক যাবতীয় নৈতিক কর্তব্য ও দায়ভার। নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণের বাধ্যবাধকতাকে নৈতিকতা পালনের অঙ্গ হিসেবে ভাবতেও ব্যর্থ হন। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজনীতি জগতের দুর্বৃত্তরা দেশ-সম্পদ লুণ্ঠনে মগ্ন হয়ে পড়ে ভুলে যায় দেশ-প্রেম বা দেশ-হিতৈষিতা। তার অসহায় শিকার হয়ে পড়ে নানা ধরণের বঞ্চনায় জেরবার হয়ে পড়া বৃহত্তম সংখ্যক দেশবাসী। সেদিকে দৃক্‌পাত করার ইচ্ছাটুকুও গুরুত্ব পায় না আলোচ্য নাগরিক মনে। তাঁরা 'এঁড়ে তর্ক' জুড়ে দেন নিজেদের ব্যর্থতা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি সরিয়ে দিতে - নিরপেক্ষতা মানে? নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় না কি? কোন একটা পক্ষ তো অবলম্বন করতেই হবে! কেউ কেউ আবার প্রশ্ন ছুড়ে দেন প্রবল প্রতিপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করে - ভোট দেন না? তারপরও নিরপেক্ষতার কথা ওঠে কি করে? কেউ কেউ আরও এক ধাপ উপরে উঠে বেদবাক্যের মতো উচ্চারণ করেন - 'নিরপেক্ষতা' শব্দটিই একটি অর্থহীন শব্দ! বস্তুত এইপ্রকার মত প্রকাশে যাঁরা কোন প্রকার সংশয় না রেখেই দৃঢ়তা দেখাতে চান তাঁদের অভিমতের বিপ্রতীপে কিছু সত্য বাক্য উচ্চারণের সদিচ্ছা নিয়েই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

যেটি এ বিষয়ে অতীব লক্ষণীয় বিষয় সেটি হল, রাজ্যে অথবা কেন্দ্রে সরকার গঠন করে যে রাজনৈতিক দল তাদের ক্ষমতার গদিতে বসার পরপরই কিছু বিশেষ পদ পূরণের জন্য দেশের বিশিষ্ট নাগরিকজনদের বেছে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের বশংবদ হয়ে থাকবেন এবং শত অন্যায়কর্ম দেখেও উচ্চবাচ্য করার হিম্মত দেখাতে পারবেন না এমন

ব্যক্তিদেরই পছন্দ করে নেন। ঠিক এখানটিতেই দেশ তথা দেশবাসীর প্রতি ভবিষ্যতে বিপদ ঘটানোর সম্ভাবনাটি তৈরি হয়ে যায়। বিশিষ্ট নাগরিক সমাজের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে প্রায় কণ্ঠরোধ করে ফেলার প্রক্রিয়ায় পরিণত করা হয়ে যায় এভাবে। তার ফলস্বরূপ এই নাগরিকবৃন্দ এবং তাদের সমর্থক গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত উপরে উল্লেখিত সংশয়প্রকাশক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন। এবার সেগুলির উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

**উত্তরপক্ষঃ**

ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার রীতি মেনে নিরপেক্ষতা না মেনে চলা নাগরিকদের 'পূর্বপক্ষ' বলা যাক। আর তাঁদের ছুড়ে দেওয়া প্রশ্নগুলির সদিচ্ছা-প্রসূত অভিমত পোষণকারীদের 'উত্তরপক্ষ' বলে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বপক্ষের নিরপেক্ষতা বিষয়ক অস্বচ্ছ চিন্তাচ্ছন্নতা উত্তরপক্ষের জন্য পীড়াদায়ক বলে পরিগণিত হয় যে যে কারণে সেগুলিই উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হল --

**ক.** নিরপেক্ষ থাকার অর্থ একটুও অস্পষ্ট নয়। কোনপ্রকার দুর্বলতাকে প্রশয় না দিয়ে সত্য ও ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে থাকা অর্থাৎ নৈতিকতা মেনে চলার নাম নিরপেক্ষতা।

**খ.** বলা হয়, নিরপেক্ষ থাকা যায় না কারণ কোন একটি পক্ষকে তো অবলম্বন করতেই হবে। কিন্তু কেন? সবগুলি পক্ষই যদি অপরাধ-কর্ম-সংঘটক হয় তাহলে? সেক্ষেত্রে তো নিরপেক্ষ অবস্থানের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা আরও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে! এরপরেও নিরপেক্ষতাকে অস্বীকার করা যায় কোন্ যুক্তিতে?

**গ.** কোন পক্ষ (অবশ্যই দলীয়) কে অবলম্বন তো করতেই হবে -- কেন? সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনের পথ তো খোলাই আছে! তাহলে? যদি তাকেও পক্ষাবলম্বন বলে অসদার্থে গণ্য করা হয় তাহলে সেটি মূর্খতার নামান্তর ভিন্ন কিছু নয়।

**ঘ.** ভোট দেওয়ার অর্থ পক্ষাবলম্বন করা বলে গণ্য হলে সেটি হাসির উদ্রেক করে। আজ যিনি ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে স্বীকৃতি পাবেন কাল তাকেই বর্জন করার অধিকার নাগরিক জনের জন্য ন্যায্য অধিকার।

**ঙ.** 'নিরপেক্ষতা' শব্দটি অর্থহীন বলে যারা মুখের জোরে উড়িয়ে দিতে চান

তাঁরা তা করুন। তবে বাস্তব সত্য হল, নিরপেক্ষতা একটি কঠোর আয়াস সাধ্য মানবিক গুণ। স্বার্থান্ধ মানুষের পক্ষে এই গুণ অর্জন করা অসম্ভব। তবে একথা মানতে হবে যে, এই গুণ যদি কেউ আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়, তা দোষের নয়। কিন্তু তাই বলে একে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা নিন্দনীয়, নিঃসন্দেহে। বিশেষত গুণী-জ্ঞানী নাগরিক জনের এমন মনোবৃত্তি একই সঙ্গে ক্ষতিকারক এবং নিন্দনীয় তো বটেই। তাঁরাই দেশের বাকি মানুষদের পথ-প্রদর্শক বলে বিবেচিত হন যে, সে কথা তাঁরা ভুলে থাকলে সে অপরাধ গর্হিত বলেই গণ্য হবে।

**পরিশিষ্টঃ**

নাগরিক সমাজের নিরপেক্ষতা সংখ্যাধিত দেশবাসীর কাছে অক্সিজেনসম। তাঁরা তাঁদের মর্যাদা দিয়ে প্রাণে সাহস পান, বাঁচার খোরাক সংগ্রহ করেন, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার উদ্দীপিত হয়ে সৎ জীবনযাপনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করতে উজ্জীবিত হন। অন্যথায় অসাধুজনেদের দৌরাত্ম-কবলিত হয়ে তাঁরা জীবনের পথে চলতে নৈতিকতা হারিয়ে পথভ্রষ্ট হন। সেটি সমগ্র দেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিসাধক এবং সে সত্য যদি নাগরিক সমাজের কাছে গুরুত্ব না পায়, তা আরও ভয়াবহ।

*******

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

# আকরামুল হক

খিদিরপুরের এক অখ্যাত বস্তি একবালপুরে এক অতি নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম আকরামুল হকের। স্থানীয় কর্পোরেশন বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা। সেই খিদিরপুর থেকেই সমাজ সেবায় হাতে খড়ি। ১৯৭১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই এলাকার উন্নয়নের জন্য সমবয়সী বন্ধুদের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বস্তিতে বস্তিতে তখন সমস্যার স্তুপ। নিরক্ষরতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। যক্ষা, কলেরার মত সংক্রামক রোগজীবাণু এবং তৎসহ অজ্ঞতা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতো। এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং সুস্থ ভাবে বাঁচার তাগিদে স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে তিনি টানা দশ বছর স্বেচ্ছায় কাজ করেছেন। এই কাজের সাথে সাথে লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন।

১৯৮০ থেকে ২০০৩ অবধি ক্যালকাটা আর্বান সার্ভসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মহিলা সশক্তিকরণ প্রকল্প সামলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কলকাতা তথা পাশ্ববর্তী জেলার গ্রামে গঞ্জে প্রায় ৫২টি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। ঐ সময় নন-ফরমাল শিক্ষা ক্ষেত্রে বলা যায় একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৯৬ সালে 'স্বরাজ' নামে একটি সামাজিক সংস্থা গড়ে তোলেন। সেখান থেকে তিনি বস্তিতে বস্তিতে স্বল্প লেখাপড়া জানা ও নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করেন।

তিনি শ্রীমায়াপুরের ইসকন, বাঁকুড়ার শময়িতা মঠ, Indian Institute of Training Development, World Vision এবং Lutheran World Service India-র Facilitator হিসাবে কাজ করেছেন। এখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

# ১৯৭৭ সালে - Indian ..... Institute Bengal থেকে পড়েছেন Development and Community Organization under.....

# ১৯৮৫ - ১৯৯০ টানা ছ'বছর বস্তিবাসীদের জন্য বাংলা মাসিক ছয় পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড 'আজকের জনপথ' প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছেন।

# দুটি বই-এর লেখক - ছড়ায় ছন্দ এবং ডাক্তারী গাছ। Published by Mrs.

Mary Ann Dasgupta, Sharehouse Charitable Foundation.

# প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০০০ পিছিয়ে পড়া মহিলাদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করেছেন।

# ২০০৬-এ MPI ফিলিপিন্সে Peace Building-এর বিষয়ে একমাস ট্রেনিং নিয়েছেন।

# বর্তমানে তিনি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় 'সম্প্রীতি' কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সচেতনতামূলক কাজ করছেন।

*******

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

# শ্রী অমিয় গোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রী অমিয় গোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের মোনাচিতুরা গ্রামে এক সভ্রান্ত পরিবারে। ছোট থেকেই ছিল বেঁচে থাকার লড়াই। পরিবারের উৎসাহে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে পড়াশুনা শেষ করেন। বর্গা আন্দোলনের সময় তাঁর পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তিনি কোনদিন নিরুৎসাহিত হন নি বরং প্রান্তিক কৃষকদের অধিকারের লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন।

ছাত্রাবস্থার পরে যখন তিনি নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত তখন বিশিষ্ট একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই অধ্যাপক আর কেউ নন তিনি হলেন শ্রী বিপ্লব হালিম। ১৯৮৩ সালে অমিয় গোপাল মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব হালিমের অনুপ্রেরণায় ইমসেতে যোগদান করেন। ইমসেতে যোগদান করে ইমসের কর্মী হিসেবে তিনি নানা রকম জনসেবামূলক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে আজ অবধি নিরলস ভাবে সমাজসেবা করে চলেছেন। ইমসে সংগঠনে এবং তাঁর এলাকায় তিনি সমাজকর্মী হিসাবে একজন পরিচিত মুখ।

নিজের আর্থিক সঙ্কট, পিতৃ-মাতৃহীন নানান পারিবারিক সমস্যা সত্ত্বেও প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি নানান সামাজিক কাজকর্মে তাঁর নিজের অবদান রেখেছেন। শিক্ষিত, মার্জিত, মৃদুভাষী এই মানুষটি চিরকালই প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকেছেন। তাঁর কাছে শ্রী বিপ্লব হালিম ছিলেন পিতৃতুল্য। বিপ্লব হালিমের আদর্শেই তাঁর পথ চলা।

তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সংগঠনের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর সারা জীবনের সমাজসেবামূলক কাজকে আমরা সম্মান জানাই।

*******

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

# শ্রী চন্দন পাল

শ্রী চন্দন পাল মহাশয় একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, যিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে গত পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে গ্রামোন্নয়ন এবং সার্বিক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। অত্যন্ত কম বয়সেই তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে সংগঠিত ভূদান এবং গ্রামদান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সম্পূর্ণকান্তি আন্দোলনেও যুক্ত হন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন নক্সাল আন্দোলন বড় আকার ধারণ করেছে, সেই সময় তিনি কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ধারাবাহিক ভাবে শান্তি মিছিল আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ কালীন পরিস্থিতিতে তিনি সল্টলেক উদ্‌বাস্তু শিবিরে সক্রিয় ভাবে সেবা কাজে যোগদান করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন সর্বদা।

২০১২ সালে আসাম এবং তার নিকটবর্তী অন্যান্য জেলাগুলিতে রাজনৈতিক ও জাতিগত হিংসার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলে তিনি সেসময় শান্তি সম্প্রীতিমূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। পাঁচ বছর সেখানে থেকে শান্তি কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। ২০১৬ সালে তিনি আসাম থেকে জম্মু ও কাশ্মীর অবধি শান্তি সদ্‌ভাবনা সাইকেল যাত্রায় নেতৃত্ব দান করেন। বর্তমানে তিনি সর্বসেবা সংঘ (সর্ব ভারতীয় সর্বোদয় মন্ডল)-এর সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী পিস্ ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে কর্মরত। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্যস্তরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

*******

# এম. এ. ওহাব

এম. এ. ওহাব সাহেব। SHIS অর্গানাইজেশন-এর ফাউন্ডার ডাইরেক্টর। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপন বাঁচা মরা সুখ অসুখের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। বাংলা যখন খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষগুলোর চরম দুর্দশার কথা সেই সময় তিনি শুধু ভেবেছিলেন তা নয়, তাদের জন্য কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কর্মযজ্ঞের খবর। ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, সাউথ কোরিয়া বিভিন্ন দেশের ডাক্তার এবং রিসার্চ টিম SHIS হেড কোয়ার্টার-এ ঘাঁটি গাড়ে এবং সুন্দরবনের দুর্গম এলাকাগুলোতে গিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে। সুন্দরবনের প্রান্তীয় মানুষ SHIS স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে আসছেন সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে।

পরবর্তীতে, নব্বই-এর শুরুর দিক থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার যৌথ উদ্যোগ নিয়ে বহুমুখী সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে SHIS-এর সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নজরদারিতে।

সুন্দরবন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের আর্ত ও দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় এগিয়ে গেছেন এবং অবিচল থেকেছেন নিজ লক্ষ্যে। এম. এ. ওহাব সাহেবের নেতৃত্বে SHIS কর্তৃক কর্মযজ্ঞের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা এতো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে SHIS, সেবা এবং সুন্দরবন এই তিন এক হয়ে গেছে শুধু আঞ্চলিক স্তরেই নয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও। জয় করে নিয়েছেন আপামর মানুষের ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

পিছিয়ে পড়া অবহেলিত সমাজের জন্য নিরন্তর নিরলস কর্মসাধনা আমাদের সকলের আজকের পথ চলা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সাহস জোগায়।

*******

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবিকা

# রহিমা খাতুন

হাওড়া জেলার বাউড়িয়ার খাসখামার গ্রামের নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের পরিচালক রহিমা খাতুন মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে নিবেদিত রেখেছেন নিজেকে। তাঁর এই বিস্তীর্ণ কর্মকান্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আজ থেকে ৭০ বছর আগে তাঁর বাবার হাত ধরেই। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে তিনি আজ সমগ্র হাওড়া জেলার জনপ্রিয় একটি মুখ। ১৯৯৫ সালে এই নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। একই বছর ''তাজমহল গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে''র হয়ে চীনের বেজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এর পরবর্তীতে নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে জড়িয়ে পড়েন। যার মুখ্যত হল মেয়েদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে নানা ভোকেশনাল ট্রেনিং ও প্রথাগত শিক্ষাদান। একজন মহিলা সমাজকর্মী হিসেবে বারংবার বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। শুধু রাজ্য সরকারি কর্মসূচীতেই নয়, ভারত সরকারের হয়েও বেশ কিছু কাজ করেন। যেমন স্মল ফ্যামিলি নর্মস, প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য ইত্যাদি। ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে তাঁর এই কর্মকান্ড। সুইডেনের একটি প্রজেক্ট রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তাঁর সংগঠন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষ কীভাবে পাবে, এ বিষয়ে যথাযথ গাইড লাইন দেন তাঁর সংগঠন। এইসব বহুমুখী কাজের সূত্র ধরে রহিমা খাতুন এবং তাঁর সংগঠন বিভিন্ন কমিটির সদস্য হন। তাঁর এই বৃহৎ কর্মজীবনে পেয়েছেন বহু স্বীকৃতি। তৃণমূলস্তরে মেয়েদের নিয়ে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর থেকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। পেয়েছেন আরো ছোট-বড় স্বীকৃতি। অংশ নিয়েছেন দেশ-বিদেশের সেমিনার এবং কনফারেন্সে। পাড়ি দিয়েছেন সুদূর চীন, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সুইডেন এবং মার্কিন মুলুকে। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে আজ তিনি নিরলস ভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছেন যা যথেষ্ঠ অনুপ্রেরণাদায়ী।

*******

২০২২-র সম্মানিত সমাজসেবক

# শ্রী শ্যামল গণ

সমাজের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষার আন্দোলনে নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অদম্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে শ্যামল গণের নাম একটি উজ্জ্বল সাক্ষর বহন করছে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই ৬৬'র খাদ্য আন্দোলনে জড়িয়ে থেকে শুরু; কখনো ছাত্রদের আন্দোলনে, কখনো বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে মানুষের জন্য নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়া বা রাজপথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে পা মিলিয়ে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখার কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ থেকেছেন। দেশ মানে তিনি বুঝেছেন শুধু 'ধুলো, মাটি, কাঁকরের কণা' নয়, দেশ মানে লক্ষ কোটি শোষিত প্রান্তিক মানুষজনের ন্যূনতম বাঁচার অধিকার ও মানবিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করা।

আন্দোলন লড়াইয়ের পাশাপাশি এই সমস্ত মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কীভাবে যুক্ত করা যায়, এ বিষয়ে তাঁর নিরলস কর্মধারা ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তিনি লোক কল্যাণ পরিষদের প্রকল্প নির্দেশক। মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনায় পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জেলার প্রায় ৬০ হাজার মহিলা কিষাণ পরিবারে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং সারা দেশের কাছে ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষের জন্য জীবিকা উন্নয়নের একটি মডেল স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

আত্মপ্রচার-বিমুখ এই মানুষটি সারা জীবনে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পান্নালাল দাশগুপ্ত, জয়প্রকাশ নারায়ণ, শিবনাথ ব্যানার্জী, বিপ্লব হালিম, দিলীপ চক্রবর্তী, অসীম দাস প্রমুখ। যে সমস্ত সংস্থায় তিনি শীর্ষ নেতৃত্বে আছেন সেই সংস্থাগুলি হল - ফোরাম অফ্ সায়েন্টিস্টস ইঞ্জিনিয়ারস এণ্ড টেকনোলজিষ্টস (ফসেট), ফোরাম অফ ভলান্টারি অর্গানাইজেশনস - পঃ বঙ্গ, জারভানি ফাউন্ডেশন, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি প্রভৃতি।

তাঁর সামগ্রিক কর্মজীবন সমাজসেবীদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ী।

*******

“জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র।
জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন
প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য।”

- স্বামী বিবেকানন্দ

প্রকাশনা : ইমসে, ১৯৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮
ফোন : ০৩৩-২৪৭৩২৭৪০
ই-মেল: bipimse1974@gmail.com / bipimse@hotmail.com